Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল বাছির
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.8
Pages	১৯১-১৯৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*

আবদুল বাছির*

বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়, প্রথম স্বাক্ষরতা সংস্করণ (৩য় সংস্করণ), ১১ মাঘ ১৩৮৬; ২৬ জানুয়ারি ১৯৮০, প্রকাশক দীন মহম্মদ, ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৫৬, প্রকাশক-প্রশান্ত কুমার সিংহ, বুক এমপোরিএম লি. কলিকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও ঐতিহাসিক। *বাঙালীর ইতিহাস* আদিপর্ব গ্রন্থটি তাঁর দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল। গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে তিনি পুস্তক রচনার কাজে হাত দেন। দীর্ঘ নয় বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি ১৩৫৬ সালে পুস্তক প্রকাশে সক্ষম হন। এ কর্মে তাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। নীহাররঞ্জন ভূমিকাতে বলেছেন; "দশবছর আগে বাংলা ১৩৪৬-এ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' আমাকে অধর চন্দ্র বক্তৃতামালায় ভারত বর্ষের বিশেষতঃ বাংলার যে কোন একটি পর্ব বা দিক সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো' শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করে পরিষৎ মন্দিরের তিনটি অধিবেশনে তা পাঠ করি। এই তিন অধিবেশনেই সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়। অধিবেশন শেষে যদুনাথ সরকার মহাশয় কাঠামোটিকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রূপান্তরিত করতে উপদেশ দেন। সুতরাং যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রেরণা ও উৎসাহ আগাগোড়া দীপ্যমান না থাকলে এ গ্রন্থ রচনা শেষ হওয়া দূরে থাক সূত্রপাতই হতো না। তার ইতিহাস ধ্যানের আদর্শ, তাঁর স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য।" (*বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, ভূমিকা, পৃ. ২০)

---

*অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) রচনার মূলে আরো একটি অভাববোধ সক্রিয় ছিল। আর তা হচ্ছে, রমেশচন্দ্রের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত এর *'History of Bengal,* (vol. I)' এর কিছুটা অপূর্ণতা। নীহাররঞ্জন নিজেই বলেছেন '*History of Bengal,* (vol. I)' বাঙলার ও বাঙালী মনীষার গৌরব সন্দেহ নেই। তবুও মনে হলো আমার কাঠামোটিকে অবলম্বন করে বাঙালীর আদিপর্বের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বোধ হয় থেকেই গেল। *(বাঙালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, ভূমিকা, পৃ. ১৮)

বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থটি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়ের অবতারণায় পাণ্ডিত্যের স্পর্শ স্বীকার্য। বহু গ্রন্থ পঠন-পাঠন, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, ক্ষেত্রানুসন্ধান, যুক্তি-তর্কের অবতারনা, তথ্যের আহরণ ও বিশ্লেষণ শক্তি – সবকিছু মিলে এ গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষকের সুবিবেচনা ও লিপিচাতুর্থ এখানে লক্ষণীয় বিষয়। ইতিহাসের ছাত্র-মাত্রই স্বীকার করবেন যে, ইতিহাস মূলত উৎসনির্ভর। এ উৎস লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক। নীহাররঞ্জন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে বিচরণ করেছেন।

এ গ্রন্থের কাঠামো সাজানো হয়েছে ইতিহাসের যুক্তি, ইতিহাসের গোঁড়ার কথা, দেশ পরিচয়, ধন-সম্বল, ভূমি বিন্যাস, বর্ণ বিন্যাস, শ্রেণী বিন্যাস, গ্রাম ও নগর বিন্যাস, রাষ্ট্র বিন্যাস, রাজবৃত্ত, দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম কর্ম ধ্যান ধারণা, ভাষা সাহিত্য-জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প কলা, ইতিহাসের ইঙ্গিত এবং পরিশিষ্ট ইত্যাদি বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। এছাড়াও আলোচ্য গ্রন্থে আছে মধ্যযুগের ৬টি মানচিত্র, ৭১টি চিত্র সম্পদ এবং একটি পাদটীকা, আর আছে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

একজন ঐতিহাসিক সত্য সন্ধানী ও যুক্তিবাদী মানুষ। ইতিহাস লেখার জন্য অজস্র মৌলিক উপাদান ও অপরিমিত জ্ঞানের দরকার। আরো দরকার চিন্তাপ্রবণতা ও পরিপূর্ণ মানসিকতা। এ দুটি গুণের অধিকারী হলেই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতে পারেন, এবং ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতি এড়াতে পারেন। নীহাররঞ্জনের লেখার মধ্যে এই প্রবণতার উপস্থিতি বিদ্যমান। প্রশাসনিক স্বার্থ, স্বধর্মপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদ তার লেখার কেন্দ্রে ভর করতে পারেনি, সত্যসন্ধানী এই অভিধাই তার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব একটি অমূল্যগ্রন্থ। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের যে বিষয়টির পরিচিতি এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তা বুঝতে হলে এর ইঙ্গিতগুলোর সঠিক উপলব্ধি প্রয়োজন। বক্তব্য না বাড়িয়েও এটা স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থটি বাংলার ইতিহাস রচনায় ও আলোচনায় নবাগত আদর্শ নিয়ে উপস্থিত। ইতিহাসের সাথে সাথে বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের দিক বিবেচনায়ও এটি অনন্য সাধারণ। এতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি লেখকের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে

সুগভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চ স্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা এবং সত্যে উপনীত হবার জন্য স্বাধীন চিন্তা করার শক্তি এ গ্রন্থকে সমগ্র প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, লেখকের প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল। সুতরাং সংগত কারণেই গ্রন্থটি ১৯৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এছাড়াও এ গ্রন্থের ভাগ্যে আরো অনেক পুরস্কার সংযোজিত হয়েছে। সবগুলোর উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি না। কিন্তু এতসব সাফল্য এবং পূর্ণতা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ পাঠে আমার মনে হয়েছে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা না থাকলে গ্রন্থটি ইতিহাসের অনবদ্য আকর গ্রন্থে উপনীত হতে পারত।

ভারতের ইতিহাস সাধনার ধারা ইউরোপীয় ইতিহাস বিদ্যার তুলনায় অনেকটা কম জটিল। কলহনের রাজ তরঙ্গিণী বার শতকে লিখিত। কিন্তু এর আগেকার কোন ইতিহাস গ্রন্থ আজও আমাদের হাতে এসে পৌছায় নি। মুসলমান আমলে এসে আমরা পাচ্ছি জিয়াউদ্দিন বারানীর 'তাবাকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থটি। কিন্তু এতেও ইতিহাসের মূল স্বর ধর্মীয়। ভারতের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুসলিম রাজত্বকে ইতিহাসের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা সময়ের প্রবণতা। যে কারণে অমুসলিম জনগণ এবং তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাননি। মোগল আমলে আব্দুল কাদের বাদাউনি ব্যতিত অন্য সব ঐতিহাসিক ইতিহাসের নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এমন কি আবুল ফজল নিজেও ঐতিহাসিক শিক্ষার আধ্যাত্মিক মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সে কারণে তিনি ইতিহাস জ্ঞানের গভীরতায় ঢুকতে পারেননি (এম আর তরফদার, ইতিহাসের দর্শন, পৃ. ১৩-১৫)। ইংরেজ আমলে এসে ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় ইতিহাস দর্শনে আমরা ভাবান্তর লক্ষ করি। জীবন ও জিজ্ঞাসায় পরিবর্তন আসে। ইউরোপের positivist ঐতিহাসিকগণ এর সূত্রপাত করেন। positivism আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন Leopold Von Ranke, J.B. Buiry, R.G. Colling wood, Mare Bloch ও Carl Marx প্রমুখ। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেই মূলত বাঙালি জাতি ইতিহাস সচেতন হয়ে উঠে। ১৭৮৪ সালে 'Asiatic Society of Bengal' প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল-এরই পথ বেয়ে রচিত হলো রাখাল দাসের *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯১৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *History of Bengal, vol. 1* (১৯৪৩) এবং নীহাররঞ্জন রায়-এর *বাঙালীর ইতিহাস* (১৯৫০) প্রভৃতি। চার্লস স্টুয়ার্ট, উইলকিন্স্, জোন্স্ ও কোলব্রুক প্রমুখ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ এদেশে ইতিহাস চর্চার যে সূত্রপাত করেন *বাঙালীর ইতিহাসে* এর প্রভাব বিদ্যমান। একাধিক অর্থেই একথা সত্য।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে *বাঙালীর ইতিহাসে* (আদিপর্ব) নতুন কোন তথ্য বা গবেষণা কর্ম নেই। লেখক নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন, "আমি সুজ্ঞাত বা স্বল্পজাত,

অনাদৃত ও অবহেলিত তথ্যগুলি নতুন করে সাজিয়েছি মাত্র, নুতন শৃঙ্খলায় বেঁধেছি মাত্র, নতুন অর্থ নির্দেশ সন্ধান করে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছি মাত্র" (*বাঙালীর ইতিহাস* আদিপর্ব. ১৩৫৬, কলিকাতা. পৃ. ২০)। এ ক্ষেত্রে পূর্বসুরীরা বহু দিনের শ্রমে ও সাধনায় তথ্য সংগ্রহাদি সহ বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্তের যে বৃহৎ কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন নীহার রঞ্জন কার্যত তাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়াস আমরা লক্ষ করি রমেশচন্দ্রের সম্পাদিত *History of Bengal* (vol. I) গ্রন্থে। ১৯৪৩ সালে যদি *History of Bengal* (vol. I) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কাঠামো সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত না হতো নীহাররঞ্জনের পক্ষে ১৯৪৯ সালে বাঙালীর ইতিহাস রচনা করা কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রমেশচন্দ্রের *History of Bengal* (vol. I) গ্রন্থটি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের চিন্তার ফসল। ফলে এর ভাষা, আদর্শ, আলোচনা পদ্ধতি, মূলবক্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমতার অভাব লক্ষ করা যায়, যাতে করে গ্রন্থের ঐক্য ও অখণ্ডতা অনেকাংশে রক্ষা করা যায়নি। অপরদিকে *বাঙালীর ইতিহাস* এক হাতের রচনা। সুতরাং এতে ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তবে এককভাবে লেখকের পক্ষে প্রাচীন বাংলার (যেখানে তথ্য অপ্রতুল) ইতিহাসের সকল বিভাগে সমানভাবে পারদর্শিতা অর্জন সম্ভবপর নয়। তাই গ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মূলবক্তা ও নির্ভরশীলতা সমভাবে স্থাপিত হতে পারেনি।

প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক হিসেবে নীহাররঞ্জন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কেননা পুরাবৃত্তকারের মতো তিনি শুধু তথ্য সন্নিবেশ ও ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেননি, প্রতিটি তথ্য ও ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্রতচারী ছিলেন। তবে সর্বক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন এমন দাবী বোধ হয় করতে পারবেন না। কেননা এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। লেখক সেন রাজবংশের উত্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তারা দক্ষিণাগত, পাল রাজাদের সৈন্যদলে, আমলাতন্ত্রে বা দক্ষিণা শক্তির আক্রমণকালে এদেশে আসেন এবং পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন – এটাই মোটামুটি লেখকের বক্তব্য; অথচ একথা তিনি ভাবলেন না যে, একটি বহিরাগত শক্তি এসেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারে না। তাঁর উচিত ছিল পাল রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর শৈথিল্যের মধ্যে এর ইঙ্গিত তালাশ করা; যা তিনি করতে পারেননি। আর এ পথে তিনিই প্রথম ব্রতচারী নন। এ বিষয়ে পূর্বে গ্রন্থ রচনা করে যারা খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ; যাঁরা পুরাবৃত্তের তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর এ প্রয়াসকে কাজে লাগিয়েছেন নীহাররঞ্জন রায়। যদিও লেখক পূর্বোক্ত মনীষীদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা

নিবেদন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে নীহাররঞ্জনের অবস্থান সকলেরই জানা। বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিষয়ক কোন নতুন উপকরণ বা উপাত্ত তিনি আবিষ্কার বা সংগ্রহ করেননি। দীর্ঘকাল যাবৎ বহু গবেষকের যত্নে আবিষ্কৃত এবং বিশ্লেষিত বহুধা বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমাহারে ইতিহাসের যে ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে তার গঠনকার্যেও তার কোন অবদান নেই। এমন কি, অধুনাজ্ঞাত সমস্ত তথ্যকেই যে তিনি বাঙালির ইতিহাস নির্মাণে কাজে লাগাতে পেরেছেন তাও বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *History of Bengal* (vol. I) প্রকাশের দ্বারাও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাব পূরণ হয়নি – এ চেতনা থেকেই *বাঙালীর ইতিহাস* রচিত – এ বক্তব্য লেখকের। সুতরাং এ রকম আদর্শস্থানীয় গ্রন্থের একটি অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল তার প্রত্যেকটি উক্তি ও সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ যথাস্থানে উল্লেখ করা। কিন্তু লেখক প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেননি। এই রীতি ভঙ্গের যে কারণ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে 'নতুন কোনো তথ্য কোনো উপাত্ত-উপকরণ, নতুন কোনো উৎস আমি আবিষ্কার করিনি। সাধারণতঃ সর্বত্রই আমি নির্ভর করেছি সপরিজ্ঞাত ও স্বল্পজাত তথ্যাদির উপর এবং যখন যেখানে যে তথ্য ও উপাদান-উপকরণ বা পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখ করেছি, প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে মূল উৎসেরও উল্লেখ করেছি, যত সংক্ষেপেই হোক। শুধুমাত্র উপরোক্ত যুক্তিতেই পাদটীকার ব্যবহার আমি গোড়া থেকেই করিনি।" (*বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব পৃ. ১৪) সুতরাং তথ্যপঞ্জি, উপাদান-উপকরণ ও টীকা-ভাষ্য ব্যবহারের পদ্ধতিগত ব্যক্তিক্রমের যে কারণ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কেননা গ্রন্থটি যদি শুধুমাত্র সাধারণ পাঠক-সমাজের জন্যই নিবেদিত হত, যদি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের দাবী না থাকত, তবে বক্তব্যের প্রমাণ উল্লেখের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারত না। যথাস্থানে যথোচিতভাবে সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখ না থাকায় একদিকে যেমন সত্য নির্ণয়ের অন্তরায় থাকল, অপর দিকে পণ্ডিত সমাজে এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয় থেকে গেল। এরূপ বিখ্যাত গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি কাম্য হতে পারে না।

বাঙালীর ইতিহাসের আরও একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে প্রত্যেক অধ্যায় শেষে যেভাবে প্রমাণপঞ্জির তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে দায়িত্ব এড়ানো ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। এতে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক-গবেষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না। ঋণ স্বীকার অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা কোন তথ্যের প্রথম সন্ধান দেন বা এর তাৎপর্যের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সঠিক স্থানে তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ না থাকলে সত্যেরই অপলাপ ঘটে। *বাঙালীর ইতিহাস* এই ত্রুটি হতে মুক্ত নয়। নীহাররঞ্জন প্রমাণ উল্লেখের যে কৈফিয়ত ভূমিকাতেই দিয়েছেন তা এই মহৎ গ্রন্থটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে

রেখেছে। বেশি দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই। কারণ গ্রন্থের ভিতরে এর প্রমাণ বিদ্যমান। শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্তের হাজার বছরের পুরানো বাঙলা ও বাঙালী প্রবন্ধটি থেকে স্পষ্টতই সংক্ষিপ্ত আকারে *বাঙালীর ইতিহাসের* বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে অথচ তথ্যপঞ্জির তালিকায় বা অন্যত্র উক্ত প্রবন্ধ ও এর রচয়িতার কোন উল্লেখই নেই। সম্ভবত লেখকের অসাবধানতার কারণেই এমনটি হয়েছে।

বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই (ইতিহাসের যুক্তি) লেখক এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রাজবৃত্ত কোন দেশের সমগ্র ইতিহাস বলে গণ্য হতে পারে না। লোকবৃত্তের পরিচয় দিলেই তবে ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে। আমরাও তাঁর সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত। তবে বাঙালীর ইতিহাসের ১৫টি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র একটি অধ্যায় (দশম অধ্যায়) বাংলার সহস্রাধিক বৎসরের রাজবৃত্তের বর্ণনা রয়েছে এবং বাকি ১৪টি অধ্যায় লোকবৃত্ত বিশ্লেষণে লেখক নিয়োজিত থেকেছেন। এ থেকে অনুমতি হয় যে, লেখক পূর্বসূরিদের নীতি ও রীতিতে ব্যত্যয় আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করেছেন রাজবৃত্তকে বহুল পরিমাণে সংকুচিত করে লোকবৃত্তকে সে অনুপাতে না বাড়ালে যথার্থ বাঙালীর ইতিহাস হতে পারে না। *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থটি হাতে নিলে এ কথা বোঝা খুব কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু অনুপাত রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিপরীত দিকে যেন একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছেন। দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে রাজবৃত্তের চেয়ে লোকবৃত্তের প্রাধান্য থাকা দরকার এ কথা বোধ করি ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করবেন; কিন্তু রাজবৃত্তকে উপেক্ষা করা যায় না কয়েকটি কারণে – প্রথমত রাজবৃত্ত হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কাল। লোকবৃত্ত এর রক্ত মাংস। সুতরাং কঙ্কাল সুদৃঢ় না হলে শুধু মাংস দ্বারা ইতিহাসের যথার্থ আকৃতি ও স্বরূপ গঠিত হতে পারে না। সে জন্যই দেখা যায় রাজবৃত্ত বিহীন সময়ে বাংলার লোকবৃত্ত অজ্ঞাত। নীহাররঞ্জনও তাঁর গ্রন্থের এক স্থানে স্বীকার করেছেন যে, "রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র নয়.... সমসাময়িক সমাজেরই রূপ কমবেশী রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। সেই সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। (*বাঙালীর ইতিহাস*, পৃ. ৩১৬) দ্বিতীয়ত রাজবৃত্ত কখনো লোকবৃত্ত থেকে আলাদা নয়। কেননা সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে ধারণার স্পষ্টতার উপরে অকেটা নির্ভরশীল। বাংলার তথা ভারতের সমাজ যে রাজকেন্দ্রিক এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সেই সাথে এটিও লক্ষণীয় যে, আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসীয় মতবাদের আকর্ষণে যথার্থ নিরপেক্ষতার রেখা থেকে সরে গিয়েছে। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তাই সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর হওয়া মুশকিল। বেশ কিছুটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার অবকাশ সেখানে রয়ে যায়।

নীহাররঞ্জনের *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থটির নামকরণও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। বাঙালীর ইতিহাসে নামের দ্বারাই লেখক বুঝাতে চান যে, এটি বাংলার জনসাধারণের ইতিহাস।

রাজা বা রাজবংশের ইতিহাস নয়। এতে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন বাঙালির ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাস ভিন্ন। বাংলার ইতিহাস বলতে প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাসকে বোঝায়। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য বোধ হয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কেননা কোনো দেশের ইতিহাস বলতে সে দেশের সর্বসাধারণের ইতিহাসই বোঝায়; যেমন, জাপানের ইতিহাস, বলতে সে দেশের ইতিহাসই নির্দেশ করে। ইংরেজি সাহিত্যেও আমরা লক্ষ করি *History of England* এবং *History of the English People* সম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। নীহাররঞ্জনের অভিপ্রায় ছিল *People's History of Bengal* রচনা করা। সুতরাং সে অর্থে গ্রন্থের নামটাও প্রাচীন বাংলার লোকবৃত্ত বা অনুরূপ কিছু হলেই আর কারো আপত্তির কোনো কারণ থাকত না। আর 'আদিপর্ব' প্রস্তাবনা নিয়েও সংশয়-বিহীন হওয়া যাচ্ছে না।

বাঙালীর ইতিহাসের বিন্যাস পদ্ধতিতে 'আদিপর্ব' শব্দটির প্রয়োগ-বিধি নিয়েও কিছু কথা বলার অবকাশ আছে। কেননা গ্রন্থ মধ্যে গুপ্তপর্ব, পালপর্ব ও সেনপর্ব ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমগ্রতার সঙ্গে অংশকে সমার্থে লক্ষ করা যাচ্ছে। সুতরাং কোন বস্তুর সমগ্রতাকে খণ্ডিত অংশের সাথে একই পরিমাণে প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে লেখক গুপ্তযুগ, পালযুগ ও সেন যুগ বলে চিহ্নিত করলে ভালো হতো। *বাঙালীর ইতিহাসের* রচনারীতি ও ভাষাশৈলী বিশেষ কিছু নয়। এর ভাষা ও রচনারীতিতে উৎকর্ষ সাধনের অনেক সুযোগ আছে এবং নানা স্থানেই সে অবকাশ সুস্পষ্ট। বর্ণ বিন্যাসে নীহাররঞ্জন 'গোপ' শব্দের অর্থ করেছেন 'লেখক' বলে (পৃ. ২৪৬)। অথচ, 'গোপ' সকল সময়ই গোয়ালা বা Milkman বলে আমরা জানি। এরূপ অনেক শব্দের কথাই বলা যায়। রচনারীতির দিক থেকেও অনেক ক্ষেত্রেই 'বাগ বিন্যাস' লক্ষ করা যায়, যা পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক বলে মনে হতে পারে। *বাঙালীর ইতিহাসের* পক্ষে এ ধরনের প্রবণতা অবশ্য বর্জনীয়।

পরিশেষে *বাঙালীর ইতিহাসে* ব্যবহৃত ৭১ টি চিত্র-সম্পদের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। বাংলার ইতিহাসের চিত্র-সম্পদ ব্যবহারের রীতি বহুল প্রচলিত। তবে একথা সত্য যে রাখাল দাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' এবং দীনেশচন্দ্রের বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থে চিত্রাবলির চরম বিকাশ ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে বিষয়ের অজস্র প্রাচুর্যে নানা তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রয়াসের ইঙ্গিতগুলো চিত্রসমূহে ধরতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু নীহাররঞ্জন তাঁর গ্রন্থে চিত্রাবলির ব্যবহারে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা তার ব্যবহৃত ৫, ৮, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৭ নং চিত্রে ইতিহাসের বিশেষ মূল্য অনুধাবন করা মুশকিল। *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থটি যারা সংশয় ও যুক্তি তর্ক সহযোগে পাঠ করবেন তারা সঠিক ইতিহাস অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।